আজকাল

সুস্থ

এপ্রিল ২০২৩ • ৩০ টাকা

বর্ষবরণে জমিয়ে খান

পেটপুজো পার্বন

ডাঃ কিংশুক দাস

'জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।
আমরা শুনেছি ওই মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনেরই ডাক'
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবার আমরা নতুনের আবাহনেই প্রহর গুনব। এ অপেক্ষা আমাদের চিরন্তন। যা কিছু পুরনো, সে সব পেছনে ফেলে আমরা আবার নতুনকে স্বাগত জানাব। আমাদের একান্ত যা কিছু, তার মধ্যে এখনও পড়ে রয়েছে বৈশাখী উদ্‌যাপন। চৈত্রের দহন জ্বালা শেষে কালবৈশাখীর মতোই প্রাণ জুড়ানো একান্ত বাঙালিদের বর্ষবরণের এ উৎসব। ভরপুর পেটপুজো, পরনে নতুন জামা আর একরাশ শুভেচ্ছায় আমরা নবআনন্দে জেগে উঠব।

পেটপুজোই মুখ্য

প্রখর, দারুণ, অতি দীর্ঘ, দগ্ধ দিন আসছে। এমন দিনের শেষেই আবার প্রকৃতি বৃষ্টিস্নাত হয়ে শীতল হয়। শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে চারপাশ। বছরের শুরুতে বৈশাখী উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা থাকে আরও সুফলা হওয়ার, অঙ্গীকার থাকে সারা বছর ভাল থাকার।

তাই হাইজিনের বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে খাওয়াটা রীতিমতো ঝুঁকির। খাওয়ার আগে নিজের হাত দুটো অন্তত পরিষ্কার করুন। বাচ্চাদেরও এমনটা শেখান।

মাছ, মাংসে রাশ টানুন

ফাস্ট ফুডের জমানায় নতুন প্রজন্মের মুখ চলছে রোল, চাউমিন, ফ্রায়েড চিকেন, ফিশ ফ্রাই, চিকেন পকোড়ার ওপর ভিত্তি করে। কেউ কেউ আবার ফাস্ট ফুড দিয়েই মিল সেরে নেন। বাড়ির তৈরি মাছ-মাংসের থেকেও রাস্তার ধারের দোকানে তৈরি মাছ-মাংসের পদ বেশি লোভনীয় মনে হয়। এমন খেতে খেতে দৈনিক প্রোটিন চাহিদার থেকেও বেশি প্রোটিন আমাদের খাওয়া হয়ে যায়। তা ছাড়া, যাঁরা জিম-কালচারের দৌলতে মাস্‌ল বাড়ায় আর টোন বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন খেয়ে থাকেন, তাঁদের তো প্রোটিন ইনটেকের পরিমাণ প্রয়োজনের অনেকটাই বেশি। মটন, চিকেন, মাছ, ডিম বা পনির ও অন্যান্য প্রোটিনযুক্ত নিরামিষ পদ বেশি খেলে ওজন বাড়া ছাড়াও যে যে কষ্টগুলো হতে পারে সেগুলো হল—

১) পেটের গোলমাল: গ্যাস, পাতলা পায়খানা, কোষ্ঠকাঠিন্য ২) শরীরে জলশূন্যতা ৩) ভিটামিন এবং মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টস ডেফিসিয়েন্সি ৪) হার্ট ও কিডনির অসুখ ৫) খিঁচুনি এবং ৬) সর্বোপরি লিভারের প্রদাহ। একজন সুস্থ মানুষের শরীরের প্রতি কেজি ওজনের জন্য দরকার ১ গ্রাম প্রোটিন। অর্থাৎ কারও ওজন যদি ৬০ কেজি হয়, তাহলে তার প্রতিদিন প্রয়োজন ৬০ গ্রাম প্রোটিন। যাঁরা কিডনি ফেলিওর, লিভার সিরোসিস এবং হার্ট ফেলিওরের রোগী, তাঁদের অতিরিক্ত প্রোটিন না খাওয়াই ভাল।

নিয়ম মানলেই কেল্লাফতে

স্বাস্থ্য আর ডায়েটের কথা ভেবে সারাটা বছর ডায়েটে যদিও বা থাকা যায়, কিন্তু উৎসব, পুজোপার্বণে পেটপুজোয় শামিল না হয়ে উপায় নেই। খাওয়াদাওয়া আনন্দ, উৎসবের একটা প্রতীক। মানুষের মধ্যে বাড়ায় বন্ধন। গড়ে বন্ধুত্ব। কাটিয়ে দেয় দুঃখ, হতাশাকেও। খাদ্যে থাকা কার্বোহাইড্রেট সেরোটোনিন লেভেলকে বাড়িয়ে মুডকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। তাই ওপরের সব ঝামেলাকে পাশ কাটিয়ে ভূরিভোজে শামিল হতেই হবে। কীভাবে? চলুন দেখে নিই সহজ কিছু উপায়—

- ক্যালরি মেপে খাওয়া সম্ভব নয়। তাই একবেলা বেশি খেলে অন্য বেলায় যতটা পারেন হালকা খাবার খান
- একই সঙ্গে ভাজাভুজি, মাছ, মাংস, ডিম আর ৫ রকমের মিষ্টি না খাওয়াই ভাল। সবচেয়ে পছন্দেরটাই খান। আর মেনুটা প্রতিদিন বদলান। এতে রসনাবোধের তৃপ্তিও অনেকটাই হবে
- খাওয়াদাওয়া সময়মতো করুন। খাওয়ার পর হজম করার জন্য একটু হেঁটে নিন
- মনে রাখবেন, পেট ভরে খাবার পর কোল্ড ড্রিঙ্কস, কুলফি বা আইসক্রিম এড়িয়ে চলুন। কারণ এতে অ্যাসিডিটি, বদহজম বাড়ে
- যে দোকানের খাবার সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে, সেই দোকানের খাবারই খান। এতে যদি ৩০ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়, তা নয় দাঁড়ান। তাতে খাবারটা যেমন টাটকা আর গরম থাকবে, তেমনই জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। আর ফাঁকা দোকানের বাসি খাবারটা খেলে ফুড পয়জনিংয়ের সম্ভাবনা বেশি
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, খাবার আগে অবশ্যই হাত ভাল করে ধুয়ে নিন
- খাবার জল যেন পরিশুদ্ধ হয়। পারলে বাচ্চার জল বয়েল বা ফিল্টার করে নিন। নিজেদেরও যেখানে-সেখানে জল না খাওয়াই ভাল
- ডায়াবেটিস, সিরোসিস, হার্ট বা হাঁপানি রোগীদের পেট ভরে না খাওয়াই ভাল। পারলে ভিড় এড়িয়ে চলুন।

একটা জিনিস সবসময় জানবেন, সুস্থ থাকলে তবেই উৎসব, পুজোপার্বণ চুটিয়ে উপভোগ করা যায়। ভুলভাল খাওয়াদাওয়া করে অসুস্থ হয়ে পড়লে আখেরে আপনারই বিপদ। সুস্থ থাকুন। নিরাপদে থাকুন। সকলের নতুন বছর দারুণ কাটুক।

ডাঃ কিংশুক দাস

সিনিয়র কনসালট্যান্ট গ্যাস্ট্রো-এন্টেরোলজিস্ট; অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ক্লিনিক্যাল টিউটর, এএইচআরএফ; হেপাটোলজিস্ট ও ইন্টারভেনশনাল এন্ডোস্কোপিস্ট, অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশ্যালিটি হসপিটাল, কলকাতা

kinsuk119@yahoo.com

রেস্তো বুঝে সেদিন রেস্তোরাঁ যাওয়ার লগ্ন। তারপর জমিয়ে গলা অবধি খাওয়া। গ্যাঁটের টাকা খরচ করে বাইরে খেলে কিছু ফেলা যায় নাকি! পেটে গদ না থাকলেও সবটা শেষ করা বাধ্যতামূলক। এতে স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস করতে হয় বইকি।

আখেরে স্বাস্থ্যের ক্ষতি

নববর্ষ হোক বা পুজো, এই যে লাগামছাড়া খাওয়াদাওয়ার একটা হিড়িক, তাতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, এতে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ পেটপুজোর মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা থাকে না। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন আর ফ্যাট অনিয়ন্ত্রিতভাবে আমাদের শরীরে যায়। অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণে পেটের গোলমাল তো হয়ই, সঙ্গে শরীরও দু'দিন ছাড়া ছাড়া বিগড়োয়। আমরা জানি, ৮,০০০ ক্যালরি খেলে শরীরের ওজন বাড়ে ১ কিলোগ্রাম। তাই কিছু উপলক্ষ হলেই এমনভাবে খাওয়াদাওয়ায় ওজন বেড়ে যাওয়াটা কোনওভাবেই আশ্চর্যের নয়। তা ছাড়া নববর্ষ মানেই বাঙালির মিষ্টির প্রতি প্রেমটা আরেকটু বেড়ে যাওয়া। এমনিতেই মিষ্টির প্রতি বাঙালিরা চিরকালই দুর্বল। এমন কোনও বাঙালি নেই, যিনি নববর্ষে মিষ্টি খান না। আমাদের মায়ের বোধনও যেমন মিষ্টিমুখে হয়, বিজয়াও তেমন মিষ্টি ছাড়া অসম্পূর্ণ। আর সেখানে নতুন বছরের শুভারম্ভে মিষ্টি থাকবে না, সেটা হতেই পারে না। এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, সারাদিনের প্রয়োজনীয় ক্যালরির সর্বোচ্চ ১০% আসতে পারে সরাসরি শুগার অর্থাৎ মিষ্টি থেকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ, সারাদিনে সর্বোচ্চ ৬ চামচ অর্থাৎ ২৫ গ্রাম পর্যন্ত চিনি খাওয়া যেতে পারে। অতএব, বুঝতেই পারছেন, আমাদের মিষ্টিতে কতখানি সংযমী হতে হবে।

শুধু কি মিষ্টি, গরম পড়লেই বিক্রি বাড়ে কোল্ড ড্রিঙ্কসের। লোকে ভাবেন, এই গরমে একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া মানে প্রাণ জুড়োনো। আখেরে কিন্তু তা নয়। মিষ্টি দেওয়া নরম ঠান্ডা পানীয়গুলোতে তেষ্টা তো মেটেই না, উপরন্তু স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। একটা ২৫০ মিলির ঠান্ডা পানীয়ের বোতলে ৩৯ গ্রাম শুগার থাকে। অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার চেয়ে দেড় গুণ বেশি। অথচ গরমের দিনে কেউ কেউ দিনে ৩-৪ বোতলও ঠান্ডা পানীয় খেয়ে নেন। তার সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার তো আছেই।

গবেষণা বলছে, এই কার্বোহাইড্রেটই স্থূলতা, হাইপারটেনশন, রক্তের কোলেস্টেরল বৃদ্ধি এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ইনফ্ল্যামেশন অর্থাৎ প্রদাহের নাটের গুরু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ভারতের কার্ডিওলজি সোসাইটি বলছে, যতটা সম্ভব সিম্পল কার্বোহাইড্রেট— অর্থাৎ মিষ্টি এড়িয়ে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট বেশি খান।

শুধু বদভ্যাস

এখন আর লুচি, আলুরদম বা সাদা আলুর তরকারি নয়, বৈশাখী আড্ডায় আমাদের প্রথম পছন্দ গিয়ে ঠেকেছে ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুডে। এগুলোয় শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হয়, তা জানার পরও আমরা চিপস, বার্গার, কোল্ড ড্রিঙ্কস ও অন্যান্য ফাস্ট ফুড ছাড়া অচল। ২০১১ সালে আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে দেখা গেছে, ৫ দিন ধরে জাঙ্ক ফুড খেলে ধৈর্য, একাগ্রতা, গতি, মনে রাখার ক্ষমতা, স্মরণশক্তি কমে যায় এবং মুড পরিবর্তন হয়ে যায়। দেখা দেয় ব্রেন ডিরাইভড নিউরোট্রফিক ফ্যাক্টর (বিডিএনএফ)-এর অভাব এবং এর ফলে মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যাম্পাসে প্রদাহ হয়। যার ফলে মস্তিষ্কের নার্ভ ও শরীরের অন্যান্য নার্ভ ফেল করতে পারে। তার জন্য অ্যালঝাইমার্স ডিজিজকে 'ডায়াবেটিস অফ ব্রেন' বলা হয়। মোদ্দা কথা, এই জাঙ্ক ফুড খাওয়াটা আদতে একটা বদভ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাইজিন মানতে হবে

যেখানে সেখানে খাওয়াদাওয়ায় সবসময়ই একটা ভয় থাকে সংক্রমণের। যে কোনও অসুখের জন্য দরকার— মানুষটা নিজে, জীবাণু এবং পরিবেশ। তাই ১০ বছর বয়সের নীচে এবং ৫০ বছরের ওপরের মানুষরা সংক্রমণে বেশি ভোগেন। যাঁদের ডায়াবেটিস, হার্ট, ফুসফুস, কিডনি বা লিভারের রোগ আছে বা যিনি স্টেরয়েড ওষুধ খান, তাঁদের সহজেই জীবাণু ধরে ফেলে। আর ধূমপায়ী হলে তো কথাই নেই। জীবাণুগুলো সবসময় ওত পেতে থাকে কখন মানুষকে সংক্রমিত করবে। হঠাৎ করে হয়ে যাওয়া বৃষ্টি এবং একটু ঠান্ডা পড়লে এরা ঘাড়ে চেপে বসে। পরিবেশটা যেন দূষিত হওয়ার জন্যই বসে আছে এই বসন্তের সময়। হাইজিনের দফারফা। বাইরে খেলে

এমন এক উৎসবের অন্যতম অংশ খাওয়াদাওয়া। বলা চলে, পেটপুজো ছাড়া বৈশাখী উদ্‌যাপন একেবারে অসম্পূর্ণ। ভাত, সোনা মুগের ডাল, আলুভাজা, মাছ, কচি পাঁঠার মাংস, চাটনি, পাপড়, মিষ্টি এ সব তো আছেই। সঙ্গে লুচি, পরোটা, ফ্রায়েড রাইস, বিরিয়ানি থেকে তন্দুরি, পিৎজা, বার্গার— কিছুই আর এখন বাদ নেই। শেষে অবশ্যই ভিন্ন রকম মিষ্টি আর আইসক্রিমও চাই। অনেকে আবার এই গরমের দিনগুলোয় কোল্ড ড্রিঙ্কস ছাড়া একেবারে অচল। কখনও কখনও মনে হয়, উৎসব উদ্‌যাপন নিছকই আড়াল, অজুহাত মাত্র; মুখ্য তো পেটপুজোই। এই পেটপুজোর মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা নেই, নেই কোনও নিয়ম। পেটপুজো অনাবিল আনন্দ দেয়, তাই বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। খাওয়াদাওয়া মানে তো শুধু উদরপূর্তি নয়, মানসিক তৃপ্তিরও ষোলোআনা মেলে ভাল-মন্দ খাওয়া থেকে। রসনাবোধের চূড়ান্ত হল পেটপুজো। তাই পেটপুজোর কোনও বিকল্প হয় না।

তালিকায় সবই

নতুন বছর বহন করে আনে অনাবিল আনন্দ, হৃদ্যতা এবং সার্বিক সুখশান্তি। সারা বছর ধরে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ধরনের খাবারের স্বাদ নিলেও, বাংলা বছরের শুরুতে প্রায় সমস্ত বাঙালিই নিজের ঘরানার খাবার খেতেই বেশি পছন্দ করেন। যার মধ্যে পড়ে লুচি-ছোলার ডাল, পরোটা-আলুরদম, শুক্তো, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, মাংসের ঘুগনি, এঁচোড়ের ডালনা, ছানার কোপতা, রুইমাছের কালিয়া, চিংড়িমাছের মালাইকারি, ইলিশমাছের পাতুরি, সরষে ইলিশ, কষা মাংস ও মাংসের বিভিন্ন পদ। মিষ্টির মধ্যে পড়ে পায়েস, মিষ্টি দই, বড় সাইজের রাজভোগ, মাথা সন্দেশ আরও কত ধরনেরই না মিষ্টি— এই তালিকার বোধহয় শেষ নেই।

গলা অবধি খেলেই সর্বোনাশ

পয়লা বৈশাখে একবারে গলা অবধি না খেলে যেন ওঠাই যায় না। একবার ভেবে দেখুন, শুক্তো, বেগুনভাজা, ডাল, এঁচোড়ের ডালনা, রুই কালিয়া খাওয়ার পরও কি চিংড়িমাছের মালাইকারি আর পাঁঠার মাংস থাকলে না খেয়ে ওঠা যায়! এরপরও তো আবার চাটনি, মিষ্টি, দই, আইসক্রিম রয়েছেই। আপাত ভাবে দেখলে বিষয়টা জমে ক্ষীর, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় পেটের মধ্যে পুরোটাই 'হযবরল'। আসলে প্রত্যেকটা মানুষের পাকস্থলীর ধারণ ক্ষমতা একেক রকম। যিনি সাধারণত বেশি খান, তাঁর পাকস্থলী বড় হয়, আর যিনি কম খান, তাঁর পাকস্থলী ছোট। তাই মিতাহারী মানুষকে ওপরের খাবারের মেনুটা দিলে তিনি তো ভয়ে খাবেনই না, আর খেলেও পাকস্থলীর দফারফা। সঙ্গে অতিরিক্ত যা সইতে হবে, তা হল— অম্বল, ঢেঁকুর, বুক জ্বালা, গ্যাস, গা বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, কারও আবার পেটব্যথার সঙ্গে পাতলা পায়খানা। এ ছাড়াও মাথা ঘোরা, জ্বর-জ্বর ভাব, শরীর ম্যাজম্যাজ করা, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া ইত্যাদিও হতে পারে। এখানে অবশ্যই বলা প্রয়োজন, একজন ডায়াবেটিসের রোগী হঠাৎ করে বেশি মিষ্টি খেয়ে কোমায় পর্যন্ত চলে যেতে পারেন। সেরকমভাবে লিভার সিরোসিস এবং ক্রনিক কিডনি ডিজিজের রোগী বেশি মাত্রায় মাছ, মাংস, ডিম, পনির, ছানা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। একজন সিওপিডি রোগীর পেট ভরে খাওয়ার জন্য হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে এবং একই কষ্ট দেখা দিতে পারে একজন গর্ভবতী মহিলারও।

স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস

আগে বাংলার প্রতিটা উৎসবের জন্য ছিল আলাদা আলাদা খাওয়াদাওয়া। তখন খাবারগুলো ছিল সুস্বাদু, স্বাস্থ্যোপযোগী। এর পাশাপাশি সেগুলোয় থাকত প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি আর রঙিন ফলমূল, যা জোগান দিত প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, মিনারেল। ছিল নিরামিষ (ছানার ডালনা, ধোঁকার ডালনা ইত্যাদি) আর আমিষের (মাছের কালিয়া, খাসির মাংস ইত্যাদি) নানা পদ। কার্বোহাইড্রেটের রমরমা তো ছিলই। তবে যেহেতু মানুষজন সে-সময় প্রচুর কায়িক পরিশ্রম ও খেলাধুলো করতেন, তাই একটু বেশি খাওয়াদাওয়া সে-সময় সমস্যা তৈরি করত না। আর আমরা যে সব খাবার খেতাম, তার বেশিরভাগটাই তৈরি হত নিজের বা আত্মীয়ের বাড়িতে। খাবারের সোর্সটা ছিল ন্যাচারাল। তৈরি হত হাইজেনিক পদ্ধতিতে। ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলে কিছুই ছিল না। এখন আমাদের সপ্তাহের সাতদিনই কাজ। আগেকার দিনের মতো ছুটির দিনে অখণ্ড অবসরের সুযোগও নেই। সারাক্ষণ দৌড় দৌড় দৌড়। নিত্যসঙ্গী স্ট্রেস। রসনার তৃপ্তিতে স্বল্প সময়ে ফাস্ট ফুডেরই রমরমা বাজার। এখন কোনও অনুষ্ঠান মানেই বাইরে খাওয়াদাওয়া। বাড়ির মা-বৌদের সেদিনটা ছুটি। তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাইরে টোটো করার পালা। পকেটের